জোড়া ভূত

বাড়িটার বিশেষ কোনও বিশেষত্ব সুবীরের চোখে পড়েনি এতদিন। নন্দিতারও। তবে হ্যাঁ, বদলি হয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে সেই যে "হা বাড়ি" "হা বাড়ি" করে জুতোর সুকতলা খুইয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটোছুটি করতে হয় শহরময়, পাঠানকোটে এসে তা করতে হয়নি সুবীরকে। অফিস জয়েন করা মাত্র বাড়ির মালিকই ফোনে যোগাযোগ করেছে, নিজের গাড়িতে চড়িয়ে বাড়ি পরিদর্শনার্থে নিয়ে গেছে। সুবীরকে সিগারেট খাইয়েছে, নন্দিতাকে কোকাকোলা। দশ বছরের বাবলুর হাতে তুলে দিয়েছে মস্ত বড় একটা ক্যাডবেরী চকোলেট। কথাবার্তা পাকা করে পরদিনই মালপত্র, স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুবীর হোটেল ছেড়ে ঢাকি রোডের এই বাসাবাড়িতে এসে উঠেছে। নিজের ভাগ্যদেবতাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রাণ ভরে।

বাড়ি সম্বন্ধে আর মাথা ঘামায়নি ওরা। ঘামাবেই বা কখন ! সকাল আটটায় বার হয়ে যায় মানুষটা। অফিসের কাজ সেরে বাজার-হাট করে, সংসারের নানা খুচরো প্রয়োজন মিটিয়ে, বাড়ি এসে চা জলখাবার খেয়ে একটু জিরোতেই অন্ধকার হয়ে যায়। তখন আধা ঘুমন্ত ছেলেকে ধরে পাকড়ে বসিয়ে তার বই খাতা হাতড়ে হোম ওয়ার্ক, ক্লাস ওয়ার্ক, টেস্টের পড়া তৈরী। এতকাল নন্দিতাই করেছে এ সব, কিন্তু এখন আর পেরে ওঠে না। দু'নম্বর যেটা আসছে, তার ধকল ও ভারে সাময়িক ভাবে অক্ষম সে। তার উপর শাশুড়ি এসেছেন পুত্রবধূকে খালাস করাতে। তাঁর হাজার রকম আচার-বিচার বাধা-নিষেধের জালে বন্দী নন্দিতা এখন। মনে সাধ থাকলেও ইচ্ছেমত কাজ করার সাধ্যই শুধু নয়, স্বাধীনতাও নেই তার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সুবীরকে শোবার ঘরে আঁতিপাঁতি করে কিছু খুঁজতে দেখে নন্দিতা শুধোলো, "কি খুঁজছো?"

"সিগারেটের একটা প্যাকেট ছিল, দেখছি না।"

নন্দিতা বলে, "ওখানেই হ'বে কোথাও, কোথায় আর যাবে।"

ক্ষণপ্রভার গলা পেয়ে চটপট প্রসঙ্গটি বদলে ফেললো ওরা। কারণ সুবীর যদিও ছাত্র জীবনেই ধূমপানে হাত পাকিয়েছে, ক্ষণপ্রভা পুত্রের গুণপনা সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই সুবীরের বিশ্বাস এবং এখন এই বয়সে তার সম্বন্ধে মায়ের সেই ভুল এবং ভাল ধারণাটা ভাঙতে সুবীর একেবারেই নারাজ। তাই বলে প্রায়ই দু'এক প্যাকেট করে লোপাট হয়ে গেলে কাঁহাতক চুপ করে থাকা যায় ! বিশেষ করে এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে? কাজেই তক্কে তক্কে থাকে সুবীর, যথাসাধ্য হেফাজৎ করে রাখে তার নেশার সামগ্রী। তবুও থেকে থেকেই নিখোঁজ হতে থাকে তারা অস্বস্তিকর নিয়মানুবর্তিতায়। নন্দিতার আর বেশীদিন বাকী নেই। বেশী ঘোরাঘুরি, খাটাখাটুনি একদম মানা। সকাল বিকেল গুনে গুনে পা ফেলে বাড়ির সামনে খানিকক্ষণ পায়চারী বরাদ্দ শুধু। বাকী সময়টা বিছানায় গা এলিয়ে শাশুড়ির সেবা-যত্ন ভোগ আর ক্যালেণ্ডারের পাতায় চোখ রেখে আঙুলের কড়ে দিন গোনা।

সেদিন শনিবার। সুবীরের হাফ-ডে। বাজার-হাট সেরে এতক্ষণে ফেরার কথা তার। হঠাৎ বাড়ির ওপাশে রাস্তার মোড়ে সুবীরের ক্রুদ্ধ তর্জন আর বাবলুর কান্না শুনে ধড়মড় করে উঠে জানলার কাছে এলো নন্দিতা। খুন্তিহাতে হন্তদন্ত হয়ে ক্ষণপ্রভাও এসে দাঁড়ালেন জানলায়। সুবীর তখন কান ধরে হিড়হিড় করে ছেলেকে টানতে টানতে বাড়ির ভিতর ঢুকছে। ঠেলা গাড়িতে কাঁচের বাক্স ভর্তি ফুচকা এবং লাল সালু আর গাঁদা ফুলের মালায় সুসজ্জিত মেটে হাঁড়িতে তেঁতুল গোলা নিয়ে এক ফুচকাওলা হাঁ করে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে তাদের।

বাবলুকে নিয়ে ঘরে ঢুকে তার কান ছেড়ে দিল সুবীর। ঠাস ঠাস, দুমদাম করে এলোপাতাড়ি চড় কিল মারতে লাগলো ছেলেকে।

"চুরি? চুরি বিদ্যে ধরেছ এবার? যত রকম বদ নেশা হয়েছে, কেমন? সিগারেটের প্যাকেট চুরি করা হয় রোজ। এখন আবার টাকাও চুরি করা হচ্ছে ----।"

নন্দিতা ফ্যাকাসে গলায় শুধোলো, "কি হয়েছে? কি চুরি করেছে বাবলু?"

ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে রক্তবর্ণ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালো সুবীর, "তোমার গুণধরকেই জিজ্ঞেস করো সে কথা।"

বাবলু ফুচকার অবশিষ্ট থু-থু করে ফেলে দিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলো। সুবীর আবার মারার জন্যে ওর দিকে এগিয়ে যেতেই ক্ষণপ্রভা খুন্তিধরা হাতখানা বাড়িয়ে বাধা দিলেন।

"ব্যাপারটা কি তা বলবি তো আগে?"

সুবীর মায়ের উপস্থিতি এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি।

আহত কন্ঠে বলে, "ব্যাপার আর কি? গুণের কানাই তৈরী হচ্ছে তোমার নাতি। আমি সারাদিন অফিস করবো না বাড়িঘর আগলাবো? ছেলেটা যে উচ্ছন্নে গেছে সেদিকে খেয়াল রাখে কেউ?"

'কেউ' অর্থাৎ নন্দিতা এর জবাব খুঁজে পায় না। সত্যি ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। দশ বছরের ছেলেকে পকেট-মানি দেওয়ার মত সাহেবিয়ানা কিংবা বাবুয়ানা এ সংসারে নেই। কাজেই সেই ছেলে যে এতক্ষণ রাস্তার মোড়ে ফুচকাওলার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি একটার পর একটা ফুচকা সাটিয়ে গেছে, এর অর্থ দিবালোকের মতই প্রাঞ্জল নন্দিতার কাছে। তাই সে আর কথা বলতে পারে না। দু'হাতে খাটের বাজু চেপে ধরে শুধু।

ক্ষণপ্রভা কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে বলেন, "তুই ওকে নিজের চোখে বিড়ি সিগারেট খেতে দেখেছিস কোনদিন?"

সুবীর গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলে না।

"তবে? ও যে নেশা করে জানলি কি করে? ছেলেটাকে ধরে ঠ্যাঙানোর আগে খোঁজ নিবি তো যে সে সত্যিই দোষী কিনা?"

পর পর ক'বার বাড়ি থেকে সিগারেট লোপাট হ'বার কথাটা উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ করে সুবীর।

ক্ষণপ্রভা বলতে থাকেন, "বিড়ি-সিগারেটের বদভ্যাস যাদের, তারা হাতে টাকা পেলে বিড়ি-সিগারেটই খায়, ফুচকা খেয়ে পয়সা ওড়ায় না।"

সুবীর মায়ের কথাটা লুফে নিয়ে গর্জে ওঠে, "ফুচকা খেয়ে ওড়ানোর পয়সাটাই বা ও কোথা থেকে পায়? এই বয়সেই চুরি বিদ্যে ধরেছে।

ছেলে নয়, বংশের কুলাঙ্গার।"

চড় বাগিয়ে তেড়ে যায় বাবলুর দিকে।

ক্ষণপ্রভা নাতিকে হ্যাঁচকা টানে বাপের চড়ের আওতা থেকে সরিয়ে এনে ব্যথিত কন্ঠে বলেন, "হ্যাঁ দাদুভাই, তুমি চুরি করেছ?"

বাবলু তাঁর আঁচলে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, "আমি চুরি করিনি। ও টাকা আমি পেয়েছি।"

"কোথায় পেয়েছ?"

বাবলু আঁচল থেকে মুখ বার করে ভাঁড়ার ঘরের দিকে আঙুল দেখায়, "মিটসেফে ছিল। নীচের তাকে।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সবাই।

বাবলু বলতে থাক, "হ্যাঁ। মিটসেফে টাকা থাকে। সেদিনও দশ টাকা ছিল ওখানে। আর একদিন দু'টো দশ টাকা ছিল।"

"কি করলে সেই টাকাগুলো?"

বাবলু বললো যে আগের টাকাগুলো দিয়ে সে কিছুই করেনি। প্রথমবার নাকি টাকাটা নিজের বইয়ের আলমারীতে রেখেছিল। খানিক পরে গিয়ে দেখে সেখানে টাকাটা নেই। দ্বিতীয়বার কুড়িটা টাকা এনে খামে ভরে শোবার ঘরে তোষকের নীচে রেখে দিয়েছিল। সেটাও খামের ভিতর থেকে উধাও হয়ে যায়।

পর পর দু'বার টাকা উবে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ বাবলু তৃতীয়বার আর ঝুঁকি নিতে চায়নি। তাই আজ টাকাটা পাওয়া মাত্র সেটা পকেটস্থ করেছে এবং ছুটে গিয়ে ফুচকাওলার হাতে গছিয়ে দিয়েছে তাড়াতাড়ি। করকরে দশ টাকার নোট পেয়ে লোকটা মহোৎসাহে বাবলুকে ফুচকা পরিবেশনে লেগে যায় এবং বাবলুও মহানন্দে সাবড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সুবীরের অকাল আবির্ভাবে দু'তরফের মহান কাজে ছেদ পড়ে অকস্মাৎ।

নন্দিতা, সুবীর ও ক্ষণপ্রভা নির্বাক ওর কথা শুনে যায় এবং তিনজনেই মনে মনে ভাবে যে ছেলেটার আর যা কিছু বদভ্যাস থাকুক না কেন, মিথ্যে কথা বলাটা একেবারেই রপ্ত হয়নি এখনও। তবে ওকে

ইদানীং মিটসেফ হাতড়াতে দেখেছে সকলেই এবং সেটা উঠতি বয়সের ছেলের স্বাভাবিক 'খাই খাই' প্রবৃত্তি বলে মেনে নিয়েছে এযাবৎ। তবে কি সেটার অন্য তাৎপর্যও আছে?

সেই ঘটনাজনিত মানসিক চাপের জন্যেই কিনা কে জানে, সেই রাত্রেই নন্দিতাকে নার্সিং হোমে যেতে হ'ল। এরপর নার্সিং হোমে প্রসূতি ও নবজাতকের তত্ত্বতল্লাস এবং বাড়ির তদারক নিয়ে সুবীরের গলদঘর্ম অবস্থা যখন, তারই মাঝে শহরের বিজলী বিভাগে দারুণ অব্যবস্থা শুরু হ'ল। যখন তখন বিনা নোটিসে দুম করে আলো চলে যায়। ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে দেশলাই আর মোমবাতী হাতড়ে ফিরতে হয়। ক্ষণপ্রভা অনেক বলে কয়ে একটা লন্ঠন কেনালেন। এক বোতল কেরোসিন তেল এলো। রাত দুপুরে দুম্ দাম্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। রান্নাঘরে এসে দেখেন তেলের বোতল উল্টে সবটুকু তেল মাটিতে পড়ে গেছে। লন্ঠন কাত হয়ে রয়েছে একধারে। বেড়ালের কাণ্ড সন্দেহ নেই তাতে। কি ভাগ্যি, লন্ঠনটা ভাঙেনি। বোতলটাও।

পরদিন আবার কেরোসিনের তাগাদা দিলেন ছেলেকে। এবার আর লন্ঠন জ্বালার জন্যে এক বোতল তেল নয়, টিন ভর্তি তেলের ফরমাস। গ্যাসের সিলিণ্ডার হালকা হ'য়ে এসেছে, যে কোন দিন নোটিস দেবে। বিজলির যা অবস্থা, হটপ্লেটের ভরসায় না থেকে এখন থেকে স্টোভের ব্যবস্থা করে রাখা ভাল। নন্দিতা বাচ্চা সমেত ফিরবে এবার, তাদের দু'জনের জল গরম, দুধ গরম, এটা সেটা কত কি লাগবে। রিক্সায় কেরোসিনের বিরাট টিন চাপিয়ে নিয়ে এলো সুবীর। ক্ষণপ্রভা ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন টিনটাকে রান্নাঘরের এক কোণে স্থাপন করে। কিন্তু এর পরের ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

সারাদিন কাঁথা সেলাই করে মাথাটা ধরে গেছিল। সন্ধ্যাবেলা একটু শুয়েছিলেন তাই এবং কখন ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। মায়ের ধকলের কথা ভেবে সুবীরও জাগায়নি তাঁকে। ঘন্টা দুয়েক লম্বা ঘুম দিয়ে যখন উঠলেন, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি আসন বিছিয়ে ছেলে ও নাতিকে খেতে ডাকলেন। রান্না করাই ছিল। সব বেড়ে-টেড়ে দিলেন ওদের। নিজেও খেলেন। তারপর আবার যখন শুলেন, কিছুতেই ঘুম এলো না তার। অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। সবাই ঘুমে

অচেতন। শুধু ক্ষণপ্রভা অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে সন্ধ্যেবেলা টেনে ঘুম দেবার মতিচ্ছন্নের জন্য নিজের মুণ্ডুপাত করছেন মনে মনে।

বাড়ির পিছনে খানিকটা পোড়ো জমি। উঁচু উঁচু কয়েকটা শাল, শিশু ও নিম গাছ। এলোপাথাড়ি হাওয়ায় গাছের ডালপালায় হুশ হুশ করে আওয়াজ হচ্ছে, যেন বিরাট কোন নিশাচর পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে ঘটাং ঘটাং ঘ্যাস করে ধাতবশব্দ শুনে চমকে ধড়মড় করে উঠে বসলেন ক্ষণপ্রভা। রান্নাঘরের দরজা জানলা নিজের হাতে বন্ধ করেছেন তিনি। ওখান থেকে এই মাঝ রাত্তিরে আওয়াজ আসছে কিসের? কান পেতে শুনলেন। মেঝেতে কিছু হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। চোর-ছ্যাঁচোড় নয় তো?

"বীরু, ও বীরু, ওঠ বাবা," ছেলের গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলেন ক্ষণপ্রভা।

সুবীর চোখ মেলে বললো, "কি? কি হয়েছে?"

ঠিক তখুনি আবার সেই রকম আওয়াজ হ'ল। এক লাফে উঠে দাঁড়ায় সুবীর। মা আর ছেলে সন্তর্পণে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। সব চুপচাপ। শুধু একটানা চাপা একটা আওয়াজ আসছে গব্ গব্ গব্ গব্। সুবীর সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে এক টানে দরজা খুলে ফেললো। ঘরের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে দু'জনেই হতবাক। রান্নাঘরে জনপ্রাণী নেই কেউ, অথচ কেরোসিনের বিরাট টিনটা ঘরের কোণ থেকে কোন অদ্ভুত উপায়ে সরে এসে ঘরের মাঝখানে উল্টে পড়ে আছে। আর সমানে গব্ গব্ করে তেল বেরিয়ে সারা ঘরময় তেলে তেলাক্কার হয়ে যাচ্ছে। বাকী তেলটুকু বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সুবীর টিনের দিকে এগিয়ে যেতেই ক্ষণপ্রভা ছিটকে এসে ছেলেকে আগলে দাঁড়ালেন। তারপর তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে রান্নাঘরের বাইরে এসে দরজার হুড়কো তুলে দিয়ে শোবার ঘরে এলেন।

ক্ষণপ্রভার কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দুই পা ঠক ঠক করে কাঁপছে।

কাঁপা কাঁপা গলায় ফিস ফিস করে বললেন, "রাম নাম কররে বীরু, রাম নাম কর। লোহা কোথায়, লোহা?"

আঁচল থেকে চাবির গোছা বার করে তার থেকে একটা চাবি খুলে ঘুমন্ত বাবলুর জামায় আটকে দিলেন সেফটিপিন দিয়ে। আর একটা চাবি দিলেন ছেলেকে। বাকীগুলো গোছাসুদ্ধু কোমরে গুঁজলেন।

পরদিন বিকেলে অফিস ফেরত বাড়িওলা মুলায়ম সিং-এর দপ্তরে গিয়ে হাজির হ'ল সুবীর। ভদ্রলোক বিনম্র মুখে উঠে এসে সাদরে অভ্যর্থনা করে সুবীরকে নিয়ে গিয়ে বসালো নিজের খাস কামরায়। সিংজী বিত্তবান সে কথা আগেই আন্দাজ করেছিল সুবীর, কিন্তু সে বিত্ত যে এমন অপরিমিত, কল্পনা করেনি সে। বিরাট হাল ফ্যাশানের বাড়ি। কাঁচের পার্টিশান করা প্রকাণ্ড হল ঘরের চারপাশে মাঝারি, ছোট, নানা সাইজের অনেকগুলো ঘর। পালিশ করা প্যানেল ও ফার্নিচার আর নিওন লাইটের আলোয় ধাঁধা লেগে যায়। চতুর্দিকে উর্দিপরা আর্দালি, দারোয়ানের আনাগোনা। কাঁচের ওপাশে টাইপিস্ট, কেরানী, খাতাবাবুরা টেবিলে ঝুঁকে পরে ওভারটাইম করছে। বাইরে নিওন লাইটের সাইনবোর্ড এবং দরজায় সোনালী নেম-প্লেট জ্বল জ্বল করছে - সরদার মুলায়ম সিং সোঢ়ি, টিম্বার মারচেন্ট।

যাবার আগে আসার কারণটা টেলিফোনে ব্যক্ত করেছিল সুবীর। তাই বাড়িওলার বক্তব্য শোনার জন্য নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলো। তাছাড়া, গতরাত্রের অভিজ্ঞতার পর সকালে উঠে সেই যে 'বাসা বদলের ব্যবস্থা না করিয়া ফিরিবো না' পণ করে বেরিয়েছিল, সারা দিন অফিসে স্থানীয় লোকেদের কথাবার্তা, শলা-পরামর্শ শুনে তার সে তেরিয়া ভাব অনেক পরিমাণে মিইয়ে গেছে। ছোট শহর বলেই যে চট করে বাড়ি পাল্টানো যায় এখানে, সুবীরের সে ধারণা নাকি একেবারেই অলীক কল্পনা। ভাল বাড়ি পাওয়া দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু তার ভাড়া জোগানো প্রায় সাধ্যাতীত। নেহাৎ এ বাড়িটার দুর্নাম আছে, তাই বিনা আয়াসে নাম মাত্র ভাড়ায় ভোগে এসেছে তার।

বাড়িটা যে ভূতুড়ে বাড়ি সে কথা সবাই জানে। তবে এ বাড়ি যখন ভাড়া নিয়েই ফেলেছে সুবীর, আর অযথা ঘাড়ে পড়ে কারণটা জানাতে

চায়নি কেউ। কারণ ও বাড়ি ছাড়লেই বা আর বাড়ি পাচ্ছে কোথায়? অমন সুন্দর খোলামেলা বাড়ি, তাও আবার খোলামকুচির দরে? তাছাড়া খবরটা জানানো প্রয়োজন বোধ করেনি তারা আর এক কারণে - ভুতুড়ে বাড়ি হ'লেও, ও বাড়িতে থাকাকালীন কারো কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে শোনেনি কেউ। শুধু বাড়ির সাবেক বাসিন্দা বুটা সিং আর তার বউ সুখজিন্দর কাউর ছাড়া। যারা নাকি ওখানে মরে ভূত হ'ল এবং যাদের দরুন বাড়ির এই খ্যাতি। জীবৎকালে মানুষ হিসেবে যে রকমই থেকে থাকুক তারা, অমন ভদ্র, নিরীহ, সহবৎওলা ভূত সত্যিই বিরল। অতএব ----।

মুলায়ম সিং সবুজ চশমা জোড়া খুলে টেবিলে নামিয়ে রেখে ডান হাত দিয়ে ভ্রমরকৃষ্ণ দাড়ি চুমরালো খানিকক্ষণ।

তারপর সুবীরের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "আপনারা এর আগে এ বাড়িতে কেরোসিন এনেছেন কখনো?"

আচমকা এই উটকো প্রশ্নে ভড়কে গেল সুবীর।

আমতা আমতা করে বললো, "কই, না তো। মনে পড়ছে না। পরশু এক বোতল এনেছিলাম, বিড়ালে উল্টে দিয়ে গেছে। আর কাল এক টিন ভর্তি।"

সিং তাকে মধ্য পথে থামিয়ে দিয়ে বলে, "ব্যানার্জি সাহেব, আমার মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। গোড়াতেই যদি বলে দিতাম ও বাড়িতে কেরোসিন আনা মানা, তাহ'লে আর এই হয়রানি পোয়াতে হ'ত না আপনাদের। কিন্তু তখন সাহস হয়নি। ভাবলাম, ও কথা বললেই কারণটা বলতে হবে আর কারণ জানলে আপনি হয়তো ও বাড়ি ভাড়া নিতে চাইবেন না, পিছিয়ে যাবেন। আমার সেদিনকার সেই কাপুরুষতা ও ছলনাটুকুর জন্যে আমি কায়মনোবাক্যে আপনার ক্ষমাপ্রার্থী।"

"কিন্তু কারণটা কি? ও বাড়িতে কেরোসিন আনা মানা কেন?"

"ও বাড়ির একজন বাসিন্দার জীবনে কেরোসিন কাল হয়েছিল প্রত্যক্ষ ভাবে, আরেকজনের ক্ষেত্রে হয়েছিল পরোক্ষ ভাবে। তাই কেরোসিনকে সহ্য করতে পারে না তারা। পাছে ও বাড়ির পরবর্তী বাসিন্দাদের কারো অনুরূপ অমঙ্গল ঘটে, তাই তারা সতত সতর্ক।

আগে-ভাগে কেরোসিনের বোতল, টিন খালি করে রাখে। কোনও ঝুঁকি নিতে দেয় না। আমার কথা এখন আপনার কাছে হেঁয়ালির মত লাগছে। কিন্তু আমার কাহিনীটা যদি ধৈর্য ধরে শোনেন তাহলে সব বুঝতে পারবেন।"

শাদা ধবধবে পোষাক পরা বেয়ারা ট্রেতে করে দু'কাপ চা ও প্লেট ভর্তি সিঙাড়া দিয়ে গেল।

মুলায়ম সিং সুবীরের দিকে প্লেটখানা এগিয়ে দিয়ে মোলায়েম সুরে বললো, "নিন ব্যানার্জী সাহেব। একেবারে গরম গরম ভাজিয়ে এনেছে।"

সুবীর একটা সিঙাড়া তুলে নিলো।

দোকানপাট বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। কর্মচারীরা দিনের কাজে ইতি দিয়ে বাড়ি চলে গেছে একে একে। দামী টেবিলের এক পাশে গদি আঁটা চেয়ারে বসে এলাচ দেওয়া সুগন্ধি চা আর সিঙাড়া খেতে খেতে সুবীর মনে মনে আজ থেকে দশ বছর আগের দৃশ্যপটে চলে গেল।

বুটা সিং বনেদি ঘরের ছেলে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে ছড়ানো তাদের বংশগত নানাবিধ পারিবারিক ব্যবসা। বুটা সিং-এর কিন্তু ব্যবসা-ট্যাবসা ভারি অপছন্দ। লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে এই তার বরাবরের অভিলাষ। বি.এস.সি. পাশ করে পাঠানকোটে চাকরি নিলো। তার বাবা-মা দিল্লীতে থাকে তখন। পাঠানকোটের বাড়িটা বন্ধ পড়ে ছিল। সেখানেই এসে অধিষ্ঠান হ'ল বুটা সিং। ভাই-বোনের মধ্যে সেই বয়োজ্যেষ্ঠ। বনেদি ঘরের মেয়ে ঠিক করা আছে তার জন্যে, সে কথা সে জানতো। কিন্তু বাবা-মা'র সে সব পাকাপোক্ত প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে প্রাক্তন সহপাঠিনী সুখজিন্দর কাউরকে বিয়ে করে বসলো দুম করে। ছেলের এই হঠকারিতায় বাবা-মা মর্মাঘাত পেলেও ছেলেকে বাসচ্যুত করেননি তাঁরা। ঢাকি রোডের ওই বাড়িটিতেই নব-দম্পতি তাদের সুখের সংসার পেতে বসলো। তবে বেশীদিন সুখে সংসার করা তাদের কুষ্ঠিতে লেখেননি বিধাতা পুরুষ।

সেই যে বলে বিষয় বিষ, সেই বিষাক্ত কীটাণু ঢুকলো বুটা সিং-এর মগজে। ওর চেনা-জানা সঙ্গী-সাথী সকলে চড়া পণে বিয়ে করে শ্বশুরের

টাকায় হালফ্যাশানের স্যুট-বুট পরে চকচকে মোটরসাইকেলে বীরদর্পে সারা শহর চষে বেড়ায়, মজাসে মৌতাত করে আর বেচারা বুটা সিং তার ফুটো কপাল নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর অনভিজ্ঞ সংসারের খরচ চালাতে হিমসিম খেয়ে যায়। পুরাতন প্রিয়া আর নতুন বউ সুখজিন্দরও ওকে সুখী করতে পারে না আর। বিন্দুমাত্র হাসি ফোটাতে পারে না বুটা সিং-এর সদা ব্যাজার মুখে। সুখজিন্দরের মনেও সুখ নেই। বাবা ছিলেন অল্প মাইনের চাকুরে। ছোট ছোট অনেকগুলো ভাই-বোন স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি বাবা রিটায়ার করেছেন, কষ্টেসৃষ্টে আহার জোটে এতগুলো প্রাণীর। অর্থাভাবে লেখাপড়া বন্ধ হ'বার সামিল। বুটা সিং-এর ইদানীংকার মতিগতি আঁচ করতে পারে সুখজিন্দর, তাই ভয়ে তাকে আর কিছু বলে না। সংসারের খরচ থেকে পয়সা জমিয়ে, বুটা সিং-এর পকেট হাতড়ে সিকি-আধুলি হাতিয়ে তার নজর বাঁচিয়ে বুড়ো বাপকে পাঠায় সে সব।

কয়েক মাস কেটে গেছে। একদিন অফিসে ওর বউয়ের নামে লেখা একখানা চিঠি পেল বুটা সিং। ওদের চিঠিপত্র অফিসের ঠিকানাতেই আসে বরাবর। এর আগেও অনেক বার চিঠি এসেছে। সেদিন কি যে মতিচ্ছন্ন ধরলো বুটা সিং-এর, খামের চিঠিখানা খুলে পড়ে ফেললো সে। শ্বশুরমশাই তাঁর মেয়েকে লিখেছেন। নানা কথার মধ্যে মেয়ের পাঠানো টাকার প্রাপ্তি স্বীকারও রয়েছে। টাকাটা যে স্বামীকে লুকিয়ে পাঠিয়েছে, এ কথা সুখজিন্দর বাপকে জানাতে পারেনি, বোধহয় আত্মসম্মানে বেধেছে তার। বাপ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে ঐ চিঠিখানা কি নিদারুণ সর্বনাশ বয়ে আনবে মেয়ের জীবনে।

চিঠি পড়ে বুটা সিং গুম মেরে রইলো। মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। অফিসের বাকী সময়টা ঘোরের মধ্যে কাটলো তার। তারপর বিকেলে যখন বাড়ি পৌঁছলো, তখন সে আর প্রকৃতিস্থ নেই। সুখজিন্দর রাতের জন্যে খানা বানাচ্ছিল। বুটা সিং পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। মকাইয়ের রুটির জন্যে আটা মাখা রয়েছে। স্টোভের উপর কলাই করা বড় ডেকচি থেকে সরষে শাকের স্বাদু গন্ধ ভেসে আসছে। এক হাতে সাঁড়াশি দিয়ে ডেকচিটা ধরে অন্য হাতে ভারী পিতলের হাতা দিয়ে ঘটাং ঘটাং করে রান্না শাকটা ভাল করে ঘুঁটছে সুখজিন্দর। আজ বুটা সিং'এর প্রিয় খাবার রাঁধছে সুখজিন্দর, কিন্তু বুটা সিং'এর মন এতটুকু

ভিজলো না তাতে। বরং মাথার মধ্যে জ্বলতে থাকা আগুনটা দাবানলের রূপ নিলো একেবারে।

রান্নাঘরের একপাশে পাঁচ লিটারের টিন ভর্তি কেরোসিন রাখা ছিল। দু'হাতে টিনটা তুলে সুখজিন্দরের কাছে এগিয়ে গিয়ে হড় হড় করে ওর মাথার উপর উপুড় করে দিল টিনটা এবং পরক্ষণেই ধাক্কা দিয়ে জ্বলন্ত স্টোভের উপর ঠেলে দিল তাকে। বেচারী সুখজিন্দর ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার আগেই তার দেহখানা একটা জ্বলন্ত মশালে পরিণত হ'ল। বুটা সিং ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে সে ঘর থেকে। সদর দরজা খুলে বেরিয়ে আসার পূর্ব মুহূর্তে ওর মনে হ'ল দরজার বাইরে যেন কিসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সুখজিন্দরের আর্তনাদ শুনে পাড়াপ্রতিবেশী আর পুলিশের লোকেরা সব এরই মধ্যে এসে গেছে নাকি? বুটা সিং সদর দরজা ছেড়ে বাড়ির পিছন দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলো। সেখানেও সেই একই আওয়াজ। বন্ধ দরজার পিছনে কারা যেন প্রতীক্ষা করছে ওর। মরীয়া বুটা সিং ছাদে গেল। বাড়ির পিছনে ফাঁকা পোড়ো জমি। ছাদের আলসেয় দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে দেয়াল বেয়ে নামার উপক্রম করতেই আচমকা কিসের শব্দ শুনে ফিরে তাকালো। তারপর হুড়মুড় করে নীচে পড়ে গেল।

মুলায়ম সিং দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে থুতনি চুলকোতে চুলকোতে বললো, "সেদিন বুটা সিং কি শুনেছিল বা দেখেছিল কেউ জানে না। এমন কি সে যে দরজা দিয়ে না বেরিয়ে ছাদ টপকাতে গেছিল কেন, সে কথাও আন্দাজ-সাপেক্ষ কেবল। পুরো ব্যাপারটা অনেক পরে লোকে জানতে পারে। সুখজিন্দর তখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুটা সিং ঘাড় মটকানো অবস্থায় পড়ে ছিল বাড়ির পিছনে শিশু গাছটার তলায়। এরপর ও বাড়িতে আমরা বছর দু'য়েক ছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর বাড়িটা পছন্দ নয় মোটেও। সেকেলে ধরণের বাড়ি। বাথরুম, কিচেন-টিচেন খুব একটা মডার্ন নয়। বাড়িতে গিজারের ব্যবস্থা নেই, বাথরুমে টাইল নেই। মেঝে সিমেন্টের। তাই বছর কয়েক আগে নিজস্ব বাড়ি বানিয়ে উঠে এসেছি আমরা।

"তবে বিশ্বাস করুন ও বাড়িতে সে দু'বছরে কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি আমাদের। শুধু কেরোসিন তেলটা আনতাম না কখনো। আপনাদের

মুলুকে আচারশীল বামুন কিংবা বিধবার ঘরে যেমন পেঁয়াজ-টেয়াজ ঢোকে না, সেই রকম কেরোসিনটাকে যদি বাতিল করতে পারেন তবে দেখবেন এ রকম পরিস্থিতি আর কখনো হ'বে না।"

"কিন্তু গ্যাস ফুরোলে তখন?"

"কয়লার ব্যবস্থা করে দেবো। পাঠানকোটে আমি টিম্বার মারচেন্ট নামে পরিচিত বটে, কিন্তু আমার আরও ব্যবসা আছে। ভাটিণ্ডায় বিরাট কয়লার ডিপো রয়েছে। সেখান থেকে বস্তা বস্তা কয়লা আনিয়ে দেবো। যত চান।"

সুবীর স্তিমিত কন্ঠে বললো, "আচ্ছা, আসি তাহ'লে।"

মুলায়ম সিং টেবিলের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে সুবীরের হাত চেপে ধরলো, "ভাই সাহেব, আপনি হয়তো ভাবছেন আপনাকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আমার স্বার্থ কি। ও বাড়ি তালাবন্ধ থাকলেই বা কি ক্ষতি। ঐ সামান্য ক'টা টাকার মুখাপেক্ষী নই আমি। কিন্তু বুটা সিং আমার ভাই, সুখজিন্দর সেই সুবাদে আমার ভাবি। আমার ভৈয়া-ভাবি সম্বন্ধে লোকে অপবাদ দিলে আমার বড় কষ্ট হয়। আপনারা যদি ভূতের ভয়ে এই বাড়ি ছেড়ে যান, তবে আর কোনদিন বাড়িখানার গতি হ'বে না। জানেনই তো, প্রতিবেশীদের স্বভাব। ডালপালা পল্লবিত করে শতখানা করে গল্প ফাঁদবে ওই বাড়ি নিয়ে। ভৈয়া আর ভাবি পাকাপাকি ভাবে ভূত প্রেতের দলে ভিড়ে যাবে। সে আমি সইতে পারবো না ভাইসাব।"

সিংজী সুবীরের হাত ছেড়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ মুছতে থাকে।

ক্ষণপ্রভা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন।

সুবীরকে দেখামাত্র শুধোন, "বাড়ি পেয়েছিস?"

সুবীর ক্লান্ত উদাস ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে।

চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে বিষন্ন গলায় বলে, "খোঁজ খবর নিয়েছি কয়েক জায়গায়।"

ক্ষণপ্রভা একটু নিরাশ হয়ে বলেন, "আর তো বেশী সময় নেই।

পরশু বউমা ছেলে নিয়ে বাড়ি আসবে। নতুন পোয়াতিকে এই বাড়িতে এনে তুলতে বাছা ভরসা হয় না আমার ----।"

সুবীর গম্ভীর গলায় বলে, "চেষ্টা তো করছি। স্কুটারের অ্যালট্‌মেন্ট আর সোদপুরের জমির রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেল করার জন্যে কালই চিঠি পাঠাচ্ছি।

ক্ষণপ্রভা অবাক হয়ে শুধোন, "সে কি রে?"

সুবীর বলে, "এ বাড়ির ভাড়া হ'ল গিয়ে একশো পঞ্চাশ। সেই টাকায় একখানা মাঝারি সাইজের ঘর পাওয়া যাবে শুধু। ফার্নিচার যে ক'খানা আছে, তা বেচে দিয়ে একটা ঘরেই কোনমতে কুলিয়ে নেওয়া যাবে। মেঝেতে ঢালা বিছানা করতে হ'বে রাতে, সেটা দিনের বেলা গুটিয়ে রাখলেই হ'বে। ঘরের এক কোণে রান্নার ব্যবস্থা চলতে পারে। কিন্তু কথা হ'ল, রাস্তার কল থেকে দশজনের সঙ্গে খিটিমিটি হাতাহাতি করে জল ভরে আনা, কমন বারোয়ারী পায়খানায় লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়ানো - তোমার বউমা মরে গেলেও রাজি হ'বে না তাতে। তাই আস্ত একখানা বাড়িই চাই আমাদের। ছ'শো সাতশো, যতই ভাড়া লাগুক।"

ক্ষণপ্রভা গালে হাত দিয়ে বলেন, "ওমা, এখানে এত ভাড়া? এ যে দেখি বড় বড় শহরের কান কাটে।"

সুবীর এতক্ষণ পরে মা'র দিকে সোজাসুজি তাকায়, "কাটবে না কেন? এখানে সবারই কি তোমার ছেলের মত অবস্থা নাকি? তাদের দোকান-পাট-ব্যবসা রয়েছে, টাকার আণ্ডিল। আর বাকি যারা, তাদের অধিকাংশই মিলিটারী। মোটা টাকা বাড়ি ভাড়া দিতে গায়ে লাগে না তাদের, সরকার সব পুষিয়ে দেয়। লাইফ ইনসিওরেন্সটাও বন্ধ করতে হ'বে এবার। বাড়িভাড়া দিয়ে যা থাকবে, ডাল-ভাত নুন-ভাতের সংস্থান করতেই ফুরিয়ে যাবে সব।"

ক্ষণপ্রভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

তারপর শুধোলেন, "বাড়িওলা কালকের ঘটনা শুনে কি বললো?"

"কি আর বলবে? ওরই ভাই আর ভাইবউ তারা। সে ভারি করুণ কাহিনী। নতুন বিয়ে হয়েছে। স্বামী স্ত্রী দু'জনে থাকতো এ বাড়িতে। স্বামী ভারি দিল-দরাজ হাসি-খুশি ভাল মানুষ। কাউকে সন্দেহ করা কি অবিশ্বাস করা তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। বউটিও অনুরূপ। বড়লোকের

আদুরে মেয়ে। বাপ বিয়ে দিয়েছে পয়সাওলা খানদানি ব্যবসাদারের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য মন্দ।

"বিয়ের পরে পরেই স্বামীর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, যাকে সে বিশ্বাস করে ম্যানেজারের পদে বসিয়েছিল, ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়ে প্রচুর ধার-দেনা ঝুলিয়ে কেটে পড়লো। রাতারাতি সর্বস্বান্ত হ'ল তারা। শ্বশুর এলো মেয়েকে নিয়ে যেতে। নির্ধন সংসারে তার আদুরে মেয়ের কষ্ট হবে ভেবে। মেয়ে গেল না। হাসিমুখে সব দুঃখ কষ্ট মাথায় তুলে নিলো। আগে ঘর ভরা কত দামী দামী আসবাবপত্র ছিল, দাস-দাসী, অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়ে গমগম করতো বাড়ি। এখন শূন্য রিক্ত সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী। দু'জনে দু'জনের সব কিছু। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতার সেটুকুও সইলো না।

"সেদিন ওদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। ভালমন্দ খওয়াদাওয়া করার কি উপহার দেবার মত সামর্থ্য নেই ওদের। স্বামীর জন্যে মহা যত্নভরে মকাইয়ের রুটি আর সরষের শাক রান্না করছে বউটি। একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে কখন। হঠাৎ দেখে গোলাপী উড়নীর প্রান্তে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ভয়ে বউটি চিৎকার করে উঠলো, 'ওগো, তুমি কোথায়? আমাকে বাঁচাও ! আমাকে বাঁচাও !'

"দিনের শেষে ক্লান্ত স্বামী বাড়ির পথে এগিয়ে আসছে তখন। অনেক আগেই বাড়ি পৌঁছানোর কথা তার, কিন্তু ফেরার পথে চুড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খুঁজে পেতে এক ডজন সবুজ কাঁচের চুড়ি কিনেছে বউয়ের জন্যে। তাতেই দেরী হয়ে গেছে। সবুজ চুড়ি ফরসা হাতে কেমন মানাবে তাই ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিল। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই স্ত্রীর আর্তনাদ কানে এল, 'আমাকে বাচাও। আমাকে বাঁচাও।' দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখে দরজা ভিতর থেক বন্ধ। পাগলের মত বাড়ির চারিদিকে ছুটোছুটি করে চেঁচাতে থাকে, 'বাঁচাও। ওকে বাঁচাও।' বাড়িতে ঢোকার কোন পথ না পেয়ে, শেষে মরিয়া হয়ে পিছন দিকে দেয়াল বেয়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করে সে। কিন্তু সফল হয় না। কার্নিশ বেয়ে ওঠার সময় পা ফসকে গিয়ে প্রাণ হারায় বেচারা। বউটি ততক্ষণে মারা গেছে। একই চিতায় দাহ করা হয় তাদের।"

ক্ষণপ্রভা আঁচলের খুঁটে চোখ মোছেন।

আড়চোখে সেদিকে চেয়ে দেখে সুবীর আবার বলে, "সেই থেকে এ বাড়িতে কেরোসিন তেল আনলেই কোনও অদৃশ্য শক্তি সব তেল মাটিতে ফেলে দেয়। লোকে বলে স্বামীর আত্মারই কাজ এটা। তার স্ত্রী কেরোসিন স্টোভে পুড়ে মরেছিল, তাই পাছে অন্য কারও জীবনে অমন সর্বনাশ ঘটে এই ভয়ে বেচারা পরলোকে গিয়েও শান্তি পায় না। সতর্ক প্রহরায় থাকে সর্বক্ষণ। এ বাড়িতে সেই দুর্ঘটনার পরও মানুষজন বসবাস করেছে। তাদের আত্মীয়রাই থেকেছে কয়েক বছর। এ বাড়িতে থাকা কালে কারো সামান্যতম অমঙ্গল ঘটেনি কখনো।"

ক্ষণপ্রভা ঘাড় নেড়ে সায় দেন, "তা ঠিক। বউমাও তো পোয়াতি অবস্থায় এসেছিল এখানে। সুভালাভালি সব কিছু হয়ে গেল। এতটুকু কষ্ট পায়নি ----।"

সুবীর বললো, "তবু বাড়িটার একটা অপবাদ হয়ে গেছে ভুতুড়ে বাড়ি বলে।"

ক্ষণপ্রভা ঈষৎ উত্তেজিত কন্ঠে বলেন, "ভুতুড়ে বাড়ি না হাতি। পাড়ার লোকের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, যতসব আজেবাজে কথা রটায়।"

"একেবারে আজেবাজে কথাও তো নয়। আমরাও তো প্রমান পেয়েছি তার।"

ক্ষণপ্রভা বলেন, "তখন তো জানতাম না ! উটকো কিছু ভেবে ভয়ে মরছিলাম। ওঁরা হ'লেন অন্য জিনিস। দেখলিনে, সেদিন হারিকেন আর বোতল থেকে কত সাবধানে তেল ফেলেছে পাছে ভেঙে গিয়ে গেরস্তের গচ্ছা লাগে ! তুই যে ওই সব ছাইপাঁশ নেশা করে শরীর গোল্লায় দিচ্ছিস, তাতেও মনে কষ্ট পায় ওরা। সামনে এসে মানা করতে পারে না তো - ওদের সূক্ষ্ম শরীর, সামনে এলেও দেখতে পাইনে আমরা, কথা বললে শুনতে পাইনে - তাই প্যাকেট সুদ্ধু সিগারেট সরিয়ে রাখে নাগালের বাইরে ----।"

সুবীর চুপ করে থাকে। সিগারেটের ব্যাপারটা মুলায়ম সিংকে পরের বার জিজ্ঞেস করবে বলে মনে মনে নোট করে রাখে।

ক্ষণপ্রভা নিজের মনে বলে চলেন, "বাবলুকে বাইরের খাবারদাবার খেতে দেওয়া হয় না বলেই ছেলেটার অত খাই খাই বাই। এই বয়সে ওটা হয়। মাঝে মাঝে ভাল দোকান থেকে এটা সেটা কিনে খাওয়ালে আর অত ঝোঁক থাকবে না। রাস্তার ধার দিয়ে ফুচকা-কুলফি-টিকিয়া নিয়ে যায়, বেচারা চেয়ে চেয়ে দেখে। ভাবে, না জানি কি অমৃত যাচ্ছে। বাড়িতে যতই ভাল-মন্দ খাক, বাজারের খাবারের উপর বাচ্চাদের লোভ থাকবেই। আহা, সতীলক্ষী সেটা বুঝতে পারে। নরম মন তো ! তাই মিটসেফের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে টাকা রেখে যায় বাছার জন্যে।"

পরদিন অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে বেরোতে যাবে, এমন সময় ক্ষণপ্রভা এসে সামনে দাঁড়ালেন। হাতে টিফিনের ডিবে।

সুবীর অভিযোগের সুরে বললো, "তুমি আবার এ সব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন? অফিসে যাহোক কিছু খেয়ে নিতাম।"

ক্ষণপ্রভা বললেন, "দু'খানা পরোটা আর আলু চচ্চড়ি করতে কি আর এমন হাঙ্গামা। রোজ রোজ বাইরের খাবার খেতে হবে না তোকে।"

সুবীর ব্রিফকেস খুলে ডিবেটা ভরলো। তারপর দরজার বাইরে যেতে উদ্যত হ'ল। ক্ষণপ্রভা হাত তুলে থামালেন। যে কথাটা এতক্ষণ বলতে দ্বিধা করছিলেন, এইবার ব্যক্ত করে ফেললেন সেটা।

"হ্যাঁরে বাবা বীরু, শোন, কাল যে তুই বলছিলি স্কুটার, জমি, লাইফ ইনসিওরেন্স সব কিছু ক্যানসেল করবি, সত্যি যেন ওরকম পাগলামি করিসনে বাবা।"

সুবীর নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করে, "কিন্তু বাড়ি বদলাতে হ'বে যে ! এ বাড়িতে থাকা কি চলবে?"

ক্ষণপ্রভা উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বললেন, "আলবৎ চলবে ! এই যে এত বাড়ি রয়েছে শহরে, কোথায় কবে কি ঘটেছে, কে কার নাড়ি নক্ষত্র জানতে গেছে। নিজেদের বসতবাটিতেও তো কত কি ঘটে যায় অনেক সময়। রাস্তাঘাটে রোজ কত লোক চাপা পড়ে মরছে। হাসপাতালে তো হমেশাই মরছে রুগীরা। ভূতের ভয়ে তাহ'লে দেশ ছেড়ে বনে চলে যেতে হয় মানুষকে। আর তাছাড়া, এঁরা হ'লেন অন্য জিনিস - নমস্য, প্রাতঃস্মরণীয় আত্মা। এঁদের ভয় করবি কেন? আমায় মাস খানেক পরেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে, ছকুর বৌকে মাঘ মাসে দিন দিয়েছে ডাক্তার। এখানে বউমা দুই ছেলে নিয়ে থাকবে।

তোর তো অফিস থেকে ফিরতে প্রায়ই রাতবিরেত হয়ে যায়। এ বাড়িতে তবু দুজন অভিভাবক রইলেন মাথার উপর. বিপদে আপদে আগলে রাখবেন সবাইকে। আমিও নিশ্চিন্ত থাকবো কিছুটা।